জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি

১৪০৭ বাং

২০০০ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি

১৪০৭ বাং

২০০০ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ১
জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২
উপক্রমনিকা ১
জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫
জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মল লক্ষ্য হবে ৫
জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত ৭
মলনীতি ও কর্মকৌশলগু লো চিহ্নিত করা হয়েছে। ৭
মলনীতি (Policy Principles): ৭
কর্মকৌশল (Policy Strategies) ৮

উপক্রমনিকা

দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার বর্তমান অবস্থাকে সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। মানুষের চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয় এমন একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন যে আশু প্রয়োজন তা প্রশ্নাতীত। এই নীতিমালার অনুসরণে এ দেশের মানুষের প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে এবং কর্ম-উদ্দীপিত ও আশান্বিত করা যাবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্মীদেরকে।

স্বাস্থ্যকে বলা হয় "ঐবধষঃয রং ধ ংঃধঃব ড়ভ পড়সঢ়ষবঃব ঢ়যুংরপধষ, সবহঃধষ ধহফ ংড়পরধষ বিষষনবরহম ধহফ সবৎবষু হড়ঃ ধহ ধনংবহপব ড়ভ ফরংবধংব ড়ৎ রহভরৎসরঃু"। স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক চাহিদাসমহের মধ্যে অন্যতম। জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। বিশ্ববাসী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমহ মানবজাতি, বিশেষ করে শিশু ও নারীর জন্মাধিকার স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে যথার্থই সজাগ। সত্যিকার অর্থে মানব জাতির জ্ঞান-গরিমা আর প্রতিভা নিয়ে বেড়ে ওঠার মলে রয়েছে তার সুন্দর দেহ সৌষ্ঠব এবং মুক্ত চিন্তা-চেতনা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পনেরো অনুচেছদে স্বাস্থ্য সেবা ও পরিচর্যার উপর নিম্নোক্তভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছেঃ

"(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ঃ

(খ) যুক্তি সংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(গ) সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা-পিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাব গ্রস্তার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার"।

অনুরূপভাবে সংবিধানের আঠারো অনুচেছদে নিম্নোক্ত অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ঃ

"(১৮)(১) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র

অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য জাতীয় পানীয় এবং স্বাস্থ্য হানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"।

উপরোক্ত কারণে স্বাস্থ্য সেবা শুধুমাত্র উন্নয়ন ও সংস্কারমলক কার্যক্রমের উপর নির্ভর করলেই চলবে না বরং মানুষের পুষ্টি, বিশুদ্ধ খাবার পানি, স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়কেও বিবেচনায় আনতে হবে। এ ছাড়া, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে (Primary Health Care) স্বাস্থ্য সেবার মল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২০০০ সালের মধ্যে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" আলমা-আতার এই ঘোষণার এই আলোকে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উপরন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নবর্ণিত ঘোষণাসমহের সাথে একমত পোষণ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেনঃ

❋ ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত "ঞযব ডড়ৎষফ ঝঁসসরঃ ভড়ৎ ঈযরষফৎবহ" এর ঘোষিত লক্ষ্যসমহের মধ্যে রয়েছে শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, শিশুদের অপুষ্টি ও নিরক্ষরতা কমিয়ে আনা এবং সেই সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের মৌলিক সেবাসমহ জনসাধারণের নিকট সহজ প্রাপ্য ও লহজ লভ্য করে তোলা। ২০০০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যসমহ অর্জনের সময়-সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে;

- ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত "The International Conference on Population and Development" এর সিদ্ধান্ত ঃ

- ২০১৫ সাল কিংবা সম্ভব হলে তার পূর্বে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনাকে সার্বজনীনভাবে সহজলভ্য করে তোলা, যার ফলশ্রুতিতে এক বছরের কম বয়সী শিশুসহ ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমে আসবে;
- টেকসই উন্নয়ন সাধনের জন্য যে সমস্ত নীতিমালা এবং কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে সেগুলির প্রত্যেকটির সাথে জনসংখ্যা কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করা; এবং
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং কর্মসংস্থানের সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মহিলা এবং বালিকাদেরকে ক্ষমতায়ন করা।
- ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত "The Beijing Women's Conference" এর ঘোষণা অনুযায়ী উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান, শিক্ষা সুবিধা এবং প্রজনন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলাদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করার অঙ্গীকার।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, বিভিন্ন সময়ে সরকার স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে আগ্রহী হয়েছে এবং শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন ও সংস্কারের পরিকল্পনার উপর সেমিনার, সভা আলোচনার মধ্যে দিয়ে দলিলপত্রও প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু কোন অর্থবহ এবং বাস্তবমুখী স্বাস্থ্যনীতি কার্যকর করা যায়নি। ফলে ক্রমশঃ স্বাস্থ্য সেবায় সংকট আরও বেড়েছে, পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার প্রচলিত এই ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমে আসছে, মানুষের প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির অসঙ্গতির কারণে হতাশার সৃষ্টি হচেছ।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমূহের মধ্যে একটি। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার[১] বিস্তৃত এই ভূখন্ড দুনিয়ার ঘনবসতি দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি ২ হাজার[১]। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করছে প্রায় ৮৮১ জন[১]। পুরুষ-মহিলা অনুপাত প্রায় সমান সমান (১.০৬ঃ১)। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলে আশংকা করা হচেছ। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭৭ ভাগ বাস করছে গ্রামাঞ্চলে, তন্মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ রয়েছে দারিদ্র্য সীমার নীচে। জনপ্রতি বার্ষিক মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) ৩৮৬ মার্কিন ডলার বা ১৯,৫৫৫ টাকা[২]। মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) গড় আয় ৩৭৩ মার্কিন ডলার বা ১৮,৮৯৬ টাকা। শিক্ষার হার শতকরা ৬০ জন[৩]। বর্তমানে গড় আয় ৬০.৮ বছর[৪]। অপুষ্টিতে ভূগছে শতকরা ৫৬.৩ জন শিশু (ওজনের ভিত্তিতে)[৪]। সংক্রামক ব্যাধি ও ডায়রিয়া এখনও শিশু-মৃত্যুর মূল কারণ। বিশুদ্ধ পানীয় জল স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অপুষ্টি-অজ্ঞতা-অশিক্ষা-কুসংস্কারে নিমজ্জিত রয়েছে জনগোষ্ঠির বিরাট অংশ।

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য দক্ষ লোকের অভাব, চিকিৎসক-নার্স-টেকনিশিয়ানের অপ্রতুলতা, অনিয়ম, প্রতিষ্ঠানসমূহের নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগী সেবার প্রতি আন্তরিকতা ও সহানুভূতির অভাব, পানি-বিদ্যুৎ সংকট, ঔষধ চুরি, নিম্নমানের খাবার, হাসপাতালে দালাল-টাউট-সন্ত্রাসীদের অবস্থান, কোথাও কোথাও কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের দোর্দন্ড প্রতাপ, দায়িত্ব বোধ ও জবাবদিহিতার অভাব এবং সর্বোপরি ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই অসহনীয় নাজুক অবস্থার মূল কারণ হলো অত্যধিক জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে রোগ ও রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি। সাময়িক প্রয়োজনে বা চাপ এড়ানোর জন্য অথবা রাজনৈতিক কারণে পরিকল্পনাহীনভাবে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং প্রত্যাশা যে হারে বেড়েছে দেশের স্বাস্থ্য সেবা সে হারে বাড়েনি।

দেশের স্বাস্থ্য অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই গড়ে উঠেছে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনায়। বেসরকারি খাত এখনও নামমাত্র এবং শুধুমাত্র বড় দুই তিনটি শহরেই সীমাবদ্ধ। অথচ বর্তমান বিশ্বে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান যুগপতভাবে কাজ করে চলছে।

সরকারি এই স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে এ দেশের বিগত সরকারগুলো কখনোই মোট বাজেটের শতকরা ৩ ভাগের বেশী বরাদ্দ করেনি। বর্তমান সরকার এ খাতে ব্যয় বাড়ানো সত্ত্বেও এখনও সরকার স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করেছে মাথাপিছু ৩.৬ মার্কিন ডলার মাত্র[৫]। হিসাব করে দেখা গেছে ন্যূনতম স্বাস্থ্য সেবা পেতে হলে মাথাপিছু অন্ততঃ ১২ মার্কিন ডলার প্রয়োজন। ক্রমশ বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করা সম্ভব।

এতদ্‌সমস্যা থাকা সত্ত্বেও অত্র অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের এক প্রশংসনীয় অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত এই অবকাঠামো বিস্তৃত তবে সেবার মান আশানুরূপ নয়। তদুপরি ভৌত অবকাঠামো এবং কারিগরী অবকাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়ে গেছে। অবকাঠামোগত এ ব্যবধান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, সমন্বয়হীনতা, সাংগঠনিক অসংগতি, পদ্ধতিগত জটিলতা এবং ব্যবস্থাপনা দুর্বলতার জন্য এ সুবিস্তৃত অবকাঠামো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

দেশের ৪,৪৭০টি ইউনিয়নের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩,২৭৫টিতে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ১,২৭৫টিতে গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল অফিসার এবং বাকিগুলোতে মেডিক্যাল এসিস্টেন্ট দ্বারা চিকিৎসা কাজ পরিচালিত হচ্ছে। দেশের সকল উপজেলা সদরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকার প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠির জন্য একটি করে কমিউনিটি হেল্‌থ ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দেশের ৩১ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে ৪০২টি, জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল আছে ৮০টি, সরকারি মেডিক্যাল কজেল হাসপাতাল ১৩টি, পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতাল ৬টি, এবং স্পেশালাইজড্‌ হাসপাতাল আছে ২৫টি। সম্প্রতি ১২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায়, ১৯টি জেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায়, ১টি জেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা হতে ৭৫ শয্যায়, ১টি জেলা হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ১২০ শয্যায়, ১টি জেলা হাসপাতালকে ১০০ হতে ১৫০ শয্যায় এবং ১টি জেলা হাসপাতালকে ১৫০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৩ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ২৭,৫৪৬[৪] জন এবং রেজিষ্টার্ড নার্সের সংখ্যা প্রায় ১৫,৮০৪ জন[৪]। দেশে ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত মোটেও সন্তোষজনক নয়। প্রতি ৪,৭১৯ জন[৪] মানুষের জন্য আছে ১ জন ডাক্তার এবং ৮,২২৬জন[৪] মানুষের জন্য আছে ১ জন নার্স। গ্রামীণ হিসাব আলাদা করলে অনুপাত আরও অসন্তোষজনক প্রতীয়মান হবে। সারা দেশে হাসপাতাল শয্যা আছে ৪০,৭৭৩টি। এর মধ্যে ২৯,৪০২টি শয্যা সরকারি হাসপাতালের আওতায় রয়েছে।

এই স্বাস্থ্য অবকাঠামোর মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য সেবা মূলতঃ তিনস্তরে বিন্যস্ত। গ্রামীণ স্বাস্থ্য অবকাঠামো, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ভিত্তি করে স্বাস্থ্য সেবার প্রাথমিক স্তর; জেলা

পর্যায়ের হাসপাতালকে ভিত্তি করে স্বাস্থ্য সেবার দ্বিতীয় স্তর; মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটসমূহ এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহকে ভিত্তি করে স্বাস্থ্য সেবার তৃতীয় স্তর গড়ে উঠেছে।

দেশের বর্তমানে ১৩টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ১৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ আছে। সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে বছরে ১,৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে বছরে ভর্তি করা হয় ৭৫০ জন। দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে প্রতি বছরে প্রায় ১,৫০০ নতুন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট তৈরি হচ্ছে। দেশে পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট আছে মাত্র ৮টি। বিষয়ভিত্তিক স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির ব্যবস্থা দেশে প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম। দেশে ডেন্টাল কলেজ আছে মাত্র ২টি, একটি নার্সিং কলেজসহ দেশে ইনষ্টিটিউট রয়েছে ৪৪টি। মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট তৈরির ইনষ্টিটিউট রয়েছে সারা দেশে মাত্র ২টি।

দেশে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ভিন্ন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে এর সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। পুষ্টি জ্ঞান এবং দেশব্যাপী পুষ্টি ব্যবস্থা কার্যক্রম এখনও গড়ে উঠেনি। সম্প্রতি বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প এবং জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পুষ্টি কার্যক্রমে বাস্তবমুখী ও সফল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে এই কার্যক্রমকে আরও দ্রুত সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক কর্মসূচি থাকলেও বিভিন্ন স্তরে বিশেষতঃ উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে রয়েছে সমন্বয়হীনতা। ফলে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে না।

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবকাঠামোগত অবস্থা এবং জনবলের পাশাপাশি বিগত বছরগুলোতে এ খাতে আমাদের কিছু প্রাপ্তিও আছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে প্রজনন হার ৬.৩ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৩[৬] এ। শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ১৪৪ জন থেকে কমে দাঁড়িয়েছে হাজারে ৫৭[৪] জন। এ হার এখনও অনেক বেশি। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্যখাতে আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচি। ইমিউনাইজেশন কার্যক্রম বিগত ৫ বছরে শতকরা ১০ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৮.৭ ভাগ[৪]। ফলশ্রুতিতে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য সূচকসমূহের এই সাফল্য আমাদের কিছুটা আশাবাদী করে তুলেছে বটে, কিন্তু এখনও দেশে মাতৃ-মৃত্যুর হার অনেক বেশি। অপুষ্টির হার আশংকাজনক। এখনও প্রতি বছর আমাদের দেশে ডায়রিয়ায় মারা যাচ্ছে হাজার হাজার শিশু। ৫ বছরের নীচে যত শিশু মারা যায় তার ২৫% মারা যাচ্ছে ডায়রিয়াজনিত রোগে। তাছাড়া, যক্ষা, কুষ্ঠ ইত্যাদি সংক্রামক ব্যধিতে এখনও অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। অধিকন্তু, এইচআইভি/এইডস্ এবং অন্যান্য মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির আশংকা থেকেও আমরা মুক্ত নই।

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে তা থেকে পরিত্রাণ আমরা সকলেই চাই। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ক্ষেত্রে আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য সুবিবেচনা, সাহস ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ভাবাবেগ-তাড়িত না হয়ে বাস্তব পরিস্থিতির চুলচেরা হিসাব নিকাশের প্রয়োজন জরুরি হয়ে পড়েছে। এ জন্য সরকারকে এবং সংশিষ্ট সকলকেই নিতে হবে উদ্যোগী ভূমিকা। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের আন্তরিকতা।

দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের স্বার্থে মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম একটি আত্ম নির্ভরশীল সাহসী কর্মোদ্যোগী স্বাস্থ্য সবল জাতি গড়ে তোলার জন্য একটি স্বাস্থ্যনীতি এখন সময়ের দাবি। একটি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আমরা জনগণের আস্থাসমৃদ্ধ স্বনির্ভর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উপহার দিতে পারি।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য হবে

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুযায়ী চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেওয়া এবং অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুযায়ী জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা ;

দ্বিতীয়তঃ

জনসাধারণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার উপায় উদ্ভাবন করা ;

তৃতীয়তঃ

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার মান গ্রহনযোগ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা ;

চতুর্থতঃ

জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করে শিশু ও মায়েদের অপুষ্টির হার হ্রাস করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ও সমন্বিত কর্মসূচি প্রদান করা ;

পঞ্চমতঃ

দেশে বর্তমানে শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাস করে আগামী ৫ বছর এ হারকে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমিত করার যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা ;

ষষ্ঠতঃ

ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিটি গ্রামে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন সন্তান প্রসব সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ;

সপ্তমতঃ

প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন করা ;

অষ্টমতঃ

প্রতিটি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সহযোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রের সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা ;

নবমতঃ

জনসাধারণ যাতে সরকারি হাসপাতাল/চিকিৎসা সংক্রান সুযোগ-সুবিধা পরিপর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালসমহের ব্যবস্থাপনা, পরিস্কার পরিচছন্নতা ও প্রদত্ত সেবার মান সন্োষজনক পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা করা ;

দশম লক্ষ্য হবে

মেডিক্যাল কলেজ এবং প্রাইভেট ক্লিনিকসমহর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও সেবার মান সম্?র্কে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও নিয়ম নীতি প্রচলন করা ;

একাদশ লক্ষ্য হবে

আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে রিপেস্নমেন্ট লেভেল অব ফার্টিলিটি (জবঢ়ষধপবসবহঃ চবাবষ ড়ভ ভধৎঃরষরঃু) অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসচিকে আরও জোরদার ও গতিশীল করা ;

দ্বাদশ লক্ষ্য হবে

অতি দরিদ্র ও অতি অল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসচিকে অধিকরতর গ্রহণযোগ্য, সহজলভ্য ও কার্যকর করার পন্থা উদ্ভাবন করা ;

ত্রয়োদশ লক্ষা হবে

মানসিক প্রতিবন্ধী ও শারীরিক বিকলাঙ্গদের সাথে সাথে বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা ;

চতুর্দশ লক্ষ্য হবে

পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ মানব সম্?দ আয়োজনের মধ্য দিয়ে জবাবদিহিতামলক ও ঈড়ংঃ বভভবপঃরাব করার পন্থা নির্ধারণ করা ;

পঞ্চদশ লক্ষ্য হবে

দেশের অভ্যন্রে সব রকমের জটিল রোগের সন্োষজনক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলন এবং চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমনের প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত মলনীতি ও কর্মকৌশলগু লো চিহ্নিত করা হয়েছে।

মলনীতি (চড়ষরপু চৎরহপরঢ়ষবং):

১. বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিককে জাতি, ধর্ম, গোত্র, আয়, পুর"ষ-মহিলা এবং বিশেষ করে শিশু ও নারীর ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ভোগ করতে প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সচেতন ও সক্ষম করে তোলা ;

২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অত্যাবশ্যক সেবাগু লো বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের যে কোন ভৌগোলিক অবস্থানের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া ;

৩. অধিক গু র"ত্বসম্"ন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুবিধা-বঞ্চিত, গরীব ও বেকারত্বপীড়িত জনগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার লক্ষ্যে বিরাজমান সম্"দের সমবন্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে ও জনগণের দায়িত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে, ব্যবস্থাপনায়, স্থানীয় তহবিল গঠনে, ব্যয়নে, মনিটরিং এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান প্রদ্ধতি পর্যালোচনায়, ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্"ক্ত করা ;

৫. সবার জন্য কার্যকর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থাসমহর সমন্বিত প্রয়াসের সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতা প্রদান;

৬. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সমন্বিত, সম্প্রসারণ ও জোরদার করার মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;

৭. স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ও গু ণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা প্রত্যেকটি নাগরিকের কাজে পৌঁছে দেয়ার জন্য সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, সেবাদান পদ্ধতি ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং তাগিদ মাফিক মানব সম্"দ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা;

৮. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সেবাগু লোকে আরও জোরদার ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে কার্যকর, ফলপ্রসু ও সুদক্ষ প্রযুক্তি গ্রহণ ও যথাযথ ব্যবহার, পদ্ধতি উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মকে উৎসাহিত করা;

৯. স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্"র্কিত বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সেবা গ্রহীতাসহ সকল নাগরিকের অধিকার, সুযোগ, দায়িত্ব কর্তব্য ও বিধিনিষেধের ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং

১০. জনগণেণ আকাঙ্খা ও চাহিদা পরণের সার্বিক সুস্থতা ও সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার অন্তর্নিহিত মলনীতি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন/প্রতিষ্ঠা করা।

কর্মকৌশল (চড়ষরপু ঝঃৎধঃবমরবং)

১. স্বাস্থ্যনীতির সঠিক বাস্বায়ন ও প্রয়োগের জন্য রাজনৈতিক সমর্থনসহ সকলের সম্মতি ও সদিচছা প্রয়োজন, যা আর্থ-সামাজিক এবং সামাজিক রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২. "সবার জন্য স্বাস্থ্য" এই মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরত্ব দেয়া হবে। স্বাস্থ্যনীতির মল লক্ষ্য হচেছ Cost-effective উপায়ে অধিক জনগণকে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করা। আরোগ্যমলক ও পুনর্বাসন সেবাগুলোর সন্তোষজনক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৩. যেহেতু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সার্বজনীনভাবে গৃহীত, সেহেতু এ পদ্ধতিতে ব্যাপক এবং ঈড়ংঃ-বভভবপঃরাব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে মল উপকরণ হিসেবে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে গ্রহণ করা হবে।

৪. স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা পরণের জন্য স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঔষধ নীতিকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত করতে হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা, নিরাপত্তা, উপকারিতা, ক্রয় ক্ষমতা এবং সর্বস্তরে জররি ঔষধের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাজারজাত ঔষধেরগুণগত মান ও ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামালের মান নিশ্চিত করার জন্য এবং ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ উদ্দেশ্যে ঔষধ প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিভিন্ন সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ সরবরাহসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন এবং তার পাশাপাশি এসব সামগ্রী উৎপাদনে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটানোর জন্য দেশীয় শিল্পপতিদের উৎসাহ প্রদান করা।

৫. রোগ-ব্যাধির বিস্তৃতির গতিবিধি ঘনিষ্ঠ পরিলক্ষণ (Epidemiological Surveillance) পদ্ধতিকে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মসচির সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে Epidemiological Surveillance এর মল দায়িত্ব দিতে হবে।

৬. প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীর পরিচর্যার ক্ষেত্রে মান সম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের মলনীতি অনুসরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, মনিটরিং ও মল্যায়ন পদ্ধতির উপর একটি সহায়িকা সরবরাহ করা হবে।

৭. সময়ের চাহিদা পরণের তাগিদে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের কর্ম কৌশল (Health and Population Sector Strategy) ও সংশিষ্ট ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে একটি স্বাস্থ্য সেবা পুনর্বিন্যাস কমিটি (Health Services Reforms Body) গঠন করা হবে, যার কাজ হবে অবকাঠামো সংস্কার, জনবল নিয়োগ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্বায়ন, কর্মীদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, উপকরণ/দ্রব্যাদির অবস্থা যাচাই, ব্যবস্থাপনা নীতিসহ স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি। সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কমিটির সুপারিশসমহ পর্যায়ক্রমে বাস্বায়ন করা।

৮. স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের জন্য সর্বস্তরের জন্য একটি সঠিক ও চাহিদা মাফিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা। কর্মদক্ষতা জ্যেষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে তৃণমল পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্য কর্মীদের পদোন্নতির জন্য ন্যায় সঙ্গতভাবে কিছু সংখ্যক পদ

সৃষ্টি করা হবে। কোন কর্মীর পদোন্নতি যাতে রুদ্ধ না করা হয় তা সযত্নে লক্ষ্য করা হবে। সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণে পাঠানোর সময়ে তাদের কর্মস্থলে বিকল্প সেবা প্রদানকারী নিশ্চিত করেই প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ বিকল্প কর্মকর্তা ব্যতীত কোন প্রশিক্ষণ ছুটি না দেবার নিয়ম চালু করা।

৯. সর্বস্তরে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ ও স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা হবে।

১০. একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Integrated Management Information System) এবং কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা সারা দেশে প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং মনিটরিং এর জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

যত শীঘ্র সম্ভব আরও দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োজিত করে বর্তমান তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরও জোরদার করতে হবে। এজন্য ব্যাপক এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জনবলের সংখ্যা ও গুণগত দিককে আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

১১. মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের রেজিস্ট্রেশন, পেশাগত মান এবং এথিক্যাল প্র্যাকটিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো কড়াকড়িভাবে তদারক করার জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের (BMDC) রূপরেখা পুনর্গঠন ও আরও শক্তিশালী করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলকেও (BNC) পুনর্বিন্যস্ত ও জোরালো করা হবে।

ফার্মাসিস্ট, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট এবং অন্যান্য প্যারামেডিকসদের সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যথাক্রমে ফার্মেসী কাউন্সিল এবং স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটি (SMF) কে পুনর্বিন্যাস ও সুসংহত করা হবে।

১২. স্বাস্থ্য সেবার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (BMA), বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন (BPMPA), আয়ুর্বেদীয় ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি ফেডারেশন ইত্যাদি পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করা হবে।

১৩. প্রয়োজনের ভিত্তিতে (need-based) চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও গণমুখী এবং যুগোপযোগী করতে হবে।

১৪. ডাক্তারদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ের উপর যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. দেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি সকল স্তরের চিকিৎসক-শিক্ষক-নার্স-প্যারামেডিক্স ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, Reorientation কোর্স, কনটিনিউয়িং মেডিক্যাল এডুকেশন কার্যক্রম, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কোর্স ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা করা এবং এ জন্য একটি জাতীয় ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠান করা হবে।

১৬. সুষ্ঠু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে মেডিক্যাল কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা হবে এবং সেগুলোর যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

১৭. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি পুষ্টি এবং একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট থাকবে, যেন এদের কর্মকান্ড প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

কমিউনিটি লিডার ও অন্যান্য দপ্তর বা সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক তথ্যাদি জনগণকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা। স্বাস্থ্য সেবার একটি লক্ষ্য হবে জনগণের পুষ্টির অবস্থানের উন্নয়ন সাধন করা।

১৮. সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের একটি "ন্যূনতম ফি" নেয়ার ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু দরিদ্র ও অক্ষম রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকবে।

১৯. সরকার নির্ধারিত আইন-কানুন ও নীতিমালার আলোকে এনজিও ও বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সরকারের পরিপূরক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা হবে।

২০. শহর ও গ্রামীণ সেবার বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তাদের কর্মস্থলে উপস্থিতি ও সর্বোত্তম সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন করতে হবে।

২১. সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে যে সমস্ত চিকিৎসক/প্রশিক্ষণার্থী সার্বক্ষণিক ও আবাসিক পদে এবং জরুরি বিভাগে কর্মরত আছেন তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে বিরত রেখে নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারি মেডিক্যাল কলেজ/হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকুরীরত কোন চিকিৎসক যদি উক্ত মেডিক্যাল কজেল/হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে আগ্রহী হন তাহলে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে তাকে সে সুযোগ দেয়া হবে।

২২. স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা আরও জোরালো করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে, যার মাধ্যমে জবাবযোগ্যতা আরও নিশ্চিত হয় এবং প্রয়োজনে কাজে গাফিলতির জন্য ত্বড়িৎ গতিতে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

২৩. জাতীয় পর্যায়ে সরকার প্রধানের নেতৃত্বে একটি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক কাউন্সিল গঠন করা হবে। এই কাউন্সিল জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে সাহায্য-সহযোগিতা ও উপদেশ প্রদান করবে এবং তার সাথে স্বাস্থ্য সেবাদান পদ্ধতিতে অর্থবহ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক কাউন্সিল স্থানীয়ভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মকান্ড মনিটরিং করবে এবং জনগণকে প্রদত্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মকান্ডের বিন্যাস, প্রয়োগ, তদারক, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করবে।

২৪. সংশিষ্ট বিভাগসমূহের সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় ও যোগসূত্রকে আরও জোরদার করা হবে।

২৫. ব্যবস্থাপনা এবং এর বিভিন্ন পদ্ধতির কার্যকারিতা, ক্লিনিক্যাল সেবাসমূহ, রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া, জনগণের সামাজিক ও অভ্যাসগত দিকসমূহ, মহামারী ইত্যাদি বিষয়ের উপর গবেষণা কর্মকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করা হবে।

তথ্য সরবরাহ পদ্ধতিকে আরও জোরদার ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজন, যাতে তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের সেবাগুলিকে আরও দ্রুতগতিতে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং এজন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করার জন্য একটি সুষ্ঠু রেফারেল পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রয়োগ এবং তা কড়াকড়িভাবে তত্ত্বাবধান করার আয়োজন করা। এর ফলে সরাসরি সর্বস্তরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে।

২৬. বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের প্রবণতা বর্জন করতে হবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সেজন্য একটি পলিসি প্ল্যানিং সেল গঠন করবে, যার সাহায্যে কার্যকর ও স্থায়ী সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৭. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্য হবে ব্যক্তি তথা ক্লায়েন্ট -কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা, যেন যার যা চাহিদা সেই মত সেবা বেছে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ধারার ব্যবস্থা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এতে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের হার কমিয়ে আনবে।

২৮. সরকারি ব্যয় বরাদ্দ যৌক্তিক প্রয়োজনে জেলা পর্যায়ের সেবা কেন্দ্র থেকে কমিউনিটি স্তরের সেবা কেন্দ্র পর্যন্ত পুনর্বন্টন করা যেতে পারে। এতে গরীব ও অভাবী জনগণ অধিক উপকৃত হবে, ব্যয় সাশ্রয় হবে ও স্বাস্থ্য সেবা সহজে পাওয়া যাবে।

২৯. প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করার জন্য সম্পৃক্ত করা হবে। সে লক্ষ্যে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার নীতিকে আরও শক্তিশালী করা হবে, যাতে এ সব চিকিৎসা পদ্ধতি স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রাখতে পারে। তার জন্য সরকারকে যথাযথ সহায়তা প্রদান, অনুদান বৃদ্ধি, ট্রেনিং এর ব্যবস্থাসহ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩০. একীভূত সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে এই একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে সকল অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা প্যাকেজ হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সেবা প্রদানের জন্য একটি সঠিক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হবে। সারাদেশে এ পদ্ধতি কাজ করবে। এজন্য সুপরিকল্পিত ও যথোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই আয়োজন করা হবে।

৩১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণখাতে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম একটি সেক্টরভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৩২. স্বাস্থ্য সেবাকে প্রত্যেক নাগরিকের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রতি ৬,০০০ জনসংখ্যার জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করা হবে এবং সেখানে ডাক্তারের পূর্ণাঙ্গ আবাসিক সুবিধার বন্দোবস্ত থাকবে।

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত জনবল এবং ভৌত ও কারিগরী অবকাঠামোর বিভিন্ন পর্যায় ও বিষয়ের বিভিন্নমুখী সমস্যা প্রতিনিয়ত অন্তরায় সৃষ্টি করছে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে। দীর্ঘদিনসর পুঞ্জীভূত এই পাহাড় পরিমাণ সমস্যা একদিনে একত্রে সমাধান করা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যাগুলোকে বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করে সুষ্ঠু সমাধানের একটি সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং পর্যায়ক্রমে

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন করা একান্ত অপরিহার্য। এ নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন করেই আমরা পেতে পারি আমাদের সকলের প্রত্যাশাপূর্ণ একটি সুন্দর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।